BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/04030052

Available Online: www.bijmrd.com | BIJMRD Volume: 4 | Issue: 03 | March 2026 | e-ISSN: 2584-1890

বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরম: ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও মৌলিক কর্তব্য

বিকাশ প্রধান

ছাত্র, এম. এড, সত্যপ্রিয় রায় কলেজ অফ এডুকেশন, সেক্টর 1, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

সারসংক্ষেপ:

বর্তমান সময়ে ভারতের রাজনীতির আঙিনায় ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে বন্দেমাতরম্ সংগীতটি একটি বিতর্কিত ও বহুল চর্চিত বিষয়। গবেষণার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বাংলা তথা পরাধীন ভারতে, বন্দে মাতরম সংগীত ও বন্দে মাতরম ধ্বনিটি বিপ্লবীদের তৎকালীন অপরাজেয় ইংরেজ প্রভুদের সাম্রাজ্যবাদের ভীত নাড়িয়ে দিয়েছিল। মূর্খ অজ্ঞ ভারতবাসীকে জাতীয়তাবাদে উজ্জীবিত করেছিল। কিন্তু কালের নিয়মে সংগীতটির ঐতিহ্য ক্রমশ ফিকে হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে (২০২৬ খ্রিস্টাব্দ) কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকায় বন্দে মাতরম গানটিকে, বিশেষ মুহূর্ত গুলোতে গানটিকে গাওয়া বাধ্যতামূলক করছে। গবেষণায় সেই নির্দেশিকা কতটা প্রাসঙ্গিক বর্তমান ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় তার একটি সুষ্ঠ সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। এই গবেষণা থেকে পেলাম কেন্দ্রীয় সরকার যদি সঠিক পন্থা অবলম্বন করে মানুষকে জোরপূর্বক না চাপিয়ে বন্দেমাতরমের ঐতিহ্য তুলে ধরে, গানটি কে সারা দেশের মানুষের কাছে গানটি গাওয়া মৌলিক কর্তব্যে পরিণত করা যাবে। আমরা এই গবেষণা থেকে গানটিকে পৌত্তলিকতার দোষে যে অভিযোগ করা হয় তা ঠিক নয় তা প্রমাণের চেষ্টা করব। এই গানটিকে মিথ বা রিচুয়াল হিসাবে না দেখে কবিকল্পনায় দেখানোর চেষ্টা করেছি। এই গানে কোন ধর্মীয় বিভেদ নাই। এই গবেষণায় গানটি কে পৌত্তলিকতার অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করার চেষ্টা করা হয়। বর্তমানে সারা বিশ্বে রনংদেহি যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদের চিন্তার উন্মেষ ঘটাতে গানটি আবার পথপ্রদর্শকের কাজ করবে। এবং ভারতীয় সংবিধানে উল্লেখিত মৌলিক কর্তব্যের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক হবে।

সুচক শব্দঃ *জাতীয়তাবাদ, বন্দে মাতরম, সংবিধান, মৌলিক কর্তব্য, পৌত্তলিকতা।*

ভুমিকাঃ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত বন্দেমাতরমের ইতিহাস আলোচনায়-বঙ্গভঙ্গ এবং স্বদেশী আন্দোলন এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বদেশী আন্দোলনে বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরম ধ্বনি ও সঙ্গীত রূপে অভূতপূর্ব প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বঙ্গভঙ্গ রদ সম্ভব হয়ে ছিল। এবং স্বদেশী আন্দোলনেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সূত্রপাত হয়। বন্দে মাতরম এর পুরো গানটি ১৯৩৭ সালের পর থেকে পুরো গাওয়া না হওয়ার কারণ হিসেবে উঠে আসে এই গানটি পৌত্তলিকতার দোষে দুষ্ট। যদিও সমালোচনা করে বলা হয় মুসলিম লীগের অভিযোগের ভিত্তিতে বন্দে মাতরমের অঙ্গচ্ছেদ করা হয়। মুসলিম লীগের বাইরে ও কেউ কেউ এই সঙ্গীতে পৌত্তলিকতার সন্ধান পেয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ভারতে হিন্দু মুসলমান সমস্যার কথা ও চলে আসে। এবং এটি সত্য যে ঐতিহাসিকভাবে ভারতের মুসলমান সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগ জাতীয়তাবাদী অন্য ভাগ স্বতন্ত্রবাদী। এই স্বতন্ত্রবাদীরা পরে দ্বিজাতি তত্ত্বে রূপান্তরিত হয়েছিল।[১] আর জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা চিরদিনই স্বাধীনতার সংগ্রামের পক্ষে ছিলেন। ১৮৮১ সালে লোক গণনা অনুসারে ব্রিটিশ ভারতে যত মুসলমান ছিলেন তার অর্ধেক বাস করত

তৎকালীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে।[২] সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নির্ণয় হয় জাতি, ধর্ম ও ভাষার উপর ভিত্তি করে। বাংলার হিন্দু ও মুসলমান অভিন্ন। বাংলার ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গেছে। বেশিরভাগ মুসলিম ধর্মান্তরিত।[৩] কার্জন বাংলায় হিন্দু মুসলমানের বিভেদ নীতির বীজ বপন করেছিলেন। এবং তারই ফলে ভারতে স্বতন্ত্রবাদী মুসলমানেরা বিশেষ ভাবে উৎসাহিত হয়েছিল এবং তারই পরিণতি হিসাবে দেখতে পাই ভারত বিভাগ। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে একমাত্র মহাত্মা গান্ধী শেষ পর্যন্ত বন্দে মাতরম কে সমর্থন করে গেছেন।[৪] এবং তিনি মনে করতেন মুসলিম লীগ পুরো গান না হোক প্রথম পংক্তি স্তুপক স্বীকার করে নেবে। সুভাষচন্দ্র বসু পুরো গানটির সমর্থক ছিলেন। এবং সারা ভারত জুড়ে জনপ্রিয় করার জন্য তিনি বাঙ্গালীদের উদ্যোগী হতে আহ্বান করেছিলেন। বন্দে মাতরম ১৮৭৪ [৫/৬]খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষদিকে ১৮ অক্টোবরের পরে কোনো এক দিন আনন্দমঠ উপন্যাসে অঙ্গীভূত হয় আনন্দমঠে বন্দেমাতরমের প্রথম গায়ক ভবানন্দ।[৭]

এই গান স্বদেশ প্রেরনায় উদ্দীপন সংগীত হিসাবে কখনো একক ভাবে আবার কখনো সমবেতভাবে গান করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশ উদ্ধারের জন্য যে কাল্পনিক সন্তান সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলেন তা অতীতের সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের ঐতিহাসিক কাহিনীর উপর নির্ভর করে। সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের কাহিনী নির্ভর তার দ্বিতীয় সৃষ্টি দেবী চৌধুরানী।[৮] বঙ্কিমচন্দ্রের ভারত কলঙ্কের প্রধান জিজ্ঞাসা ছিল ভারত বর্ষ এতকাল পরাধীন কেন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র দুটি প্রধান কারণ এর কথা বলেছেন-১. স্বতন্ত্রে অনাস্থা, ২. হিন্দু সমাজের অনৈক্য ও জাতি প্রতিষ্ঠার অভাব। মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি এই হল কমলাকান্তের আমার দুর্গোৎসবের মর্ম বাণী। আনন্দমঠের সন্ন্যাসী মহেন্দ্রকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালের মাতৃ মূর্তির বর্ণনা করেছেন। সন্ন্যাসী মহেন্দ্র কে বলেছে আজ দেশে সর্বত্র শশ্মান। তাই মা কঙ্কাল মালিনী। এই মহাশ্মশান ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটকে স্মরণ করিয়ে দেয়।[৯]

আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্রের জগদ্ধাত্রী, কালি এবং দশভুজা দুর্গার প্রতি অবলম্বন করে জন্মভূমির অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালের রূপের বর্ণনা করেছেন। বন্দে মাতরমে ৭ কোটির মধ্যে হিন্দু যেমন আছে মুসলমানও তেমনি আছে। [১০] একটি মধ্যযুগীয় জাতি যে আধ্বনিক জাতিতে রূপান্তরিত হয় তাও প্রথম পরিস্ফুট হয়েছে এই বঙ্গদেশে। তার প্রমাণ রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র। বন্দে মাতরম যে, কোন সম্প্রদায়ের সংগীত নয় তা যে সারা ভারতের সংগীত তা গান্ধীজীর একটি বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯২৭ সালে গান্ধীজি বলেন when we sing that ode to motherland, Bande Mataram we sing it to the whole of India. [১১]

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধে ঋষি অরবিন্দ বন্দে মাতরম-এর বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে তিনটি উক্তি করেছেন।

১. তার সমস্ত রচনাবলীর শ্রেষ্ঠ ভাব হলো স্বদেশ ধর্ম (religion of patriosm)।

২. আমরা যে নবজাগরণ ও স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হচ্ছি তার প্রেরণাদাতা ও রাষ্ট্রগুরু হলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

৩. বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বোচ্চ দান হল জননী জন্মভূমিকে মাতৃরূপ দর্শন।

তিনি আরো বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র জনগণকে তিনটি মহৎ বস্তু দান করে গেছেন। বাংলার সাহিত্য, বাংলা ভাষা, এবং বাঙালি জাতি।

হেমচন্দ্রের কবি কল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরম ই সারা ভারতের মহামিলনের রাখি বন্ধন সংগীত হয়ে উঠেছে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র একবার বলেছিলেন বন্দে মাতরম গানটি ভালো কি মন্দ কিছুকাল পরে তা বুঝবে, হয়তো তখন আমি নাও জীবিত থাকতে পারি। এবং তা আমরা দেখতে পেলাম ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে আঘাত এনেছিল বঙ্কিমের সপ্ত কোটি দেশের মানুষ। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে বিভেদের নীতি কার্জন প্রথম প্রবর্তিত করেছিলেন ক্রমেই তাহা ইংরেজ রাজনীতির একটি নীতি হয়ে উঠেছিল।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বাংলার যুবসমাজ, ছাত্রসমাজ, নেতৃবৃন্দ, বাংলার সংবাদপত্র যেভাবে বন্দে মাতরম ধ্বনিকে উচ্চারণের মাধ্যমে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং অনমনীয় পরিচয় দিয়েছিল তা শুধু বাঙালি জীবনে নয় সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকবে। ঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ব্যাপকভাবে বিলাতি দ্রব্য বর্জন বয়কট আন্দোলন

তীব্র আকার ধারণ করে। ঐতিহাসিক উইল ডুরান্ট যথার্থই বলেছেন ১৯০৫ সাল থেকে ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রথম সারির সৈনিক ছিল ছাত্রসমাজ। সরকারের দমননীতি যত বাড়তে লাগলো ছাত্রসমাজ ও তত মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিল। 'বন্দে মাতরম' হল স্বৈরাচারী ব্রিটিশ শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জয়ধ্বনি। শহীদরা ও ফাসির মঞ্চে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনিতে বরণ করত ফাঁসির দড়ি। বিপিনচন্দ্র পাল রচিত ইংরেজি দৈনিক পত্রের নাম ছিল বন্দেমাতারাম। এবং তার প্রচার ছিল সারা ভারত জুড়ে। মাদ্রাজের খ্যাতনামা কবি ভারতী বন্দে মাতরম মন্ত্রে প্রভাবিত হন এবং নিবেদিতার অনুপ্রেরণায় লিখলেন জয় বাংলা। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে সম্রাট পঞ্চম জর্জ দিল্লি দরবারে তা ঘোষণা করেছিলেন। এবং এটিই ছিল বাংলা তথা ভারতের প্রথম সক্রিয় আন্দোলন যা জয়লাভ করে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রাখি বন্ধন সংগীতেও কবিগুরু 'ভগবানের' কাছে প্রার্থনা করেছিলেন।

১৯১১ সালে কলকাতার কংগ্রেসের তিনদিনের অধিবেশনে প্রথম দিনে গাওয়া হয়েছিল 'বন্দে মাতরম। দ্বিতীয় দিনে রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন'। এবং তৃতীয় দিনে সরলা দেবীর 'গায়ে আজ হিন্দুস্থান' গানগুলি গাওয়া হয়েছিল। ১৯৩৮ সালে আলী জিন্নাহ যে ১১ দফা দাবি উত্থাপন করলেন তার প্রথম দাবি ছিল বন্দে মাতরম বর্জন।The Bande Mataram song to be given up. বন্দে মাতরম গানটিতে দেশকে মাতা হিসেবে তুলে ধরা হয়। দেশ জড়পদার্থ যদি হয়ে থাকে তাহলে

জাতীয় পতাকা কি তা অপেক্ষা অধিক জড় পদার্থ নয়? তাকেও তো আমরা সম্মান করি। গানটি যেহেতু বাঙালি হিন্দুর রচিত তাই পৌরাণিক কোন কোন দেবতার নাম তুলে ধরেছেন। আমরা যদি আক্ষরিক অর্থ না দেখে বন্দে মাতরম সঙ্গীতের মর্মগত ভাবটি বোঝার চেষ্টা করি তাহলে মনে হয় আমরা গানটির সঠিক গুরুত্ব বুঝতে পারব। বন্দে মাতরম

গানটি বঙ্কিমচন্দ্র বাংলায় আনুবাদ করেছিলেন।[২২]

"বন্দে মাতরম"

সুজলাং, সুফলাং, মলয়জ শীতলাং,

শষ্যশ্যামলাং, মাতরং।

শুভ্র - জোৎস্না - পুলকিত যামিনিং

ফুল্লকুসুমিত - দুমদল - শোভিনং

সুহাসিনিং সুমধুরভাষিনীং সুখদাং, বরদাং, মাতরং,

সপ্তকোটীকণ্ঠ - কলকলনিনাদ করালে

দ্বিসপ্তকোটিভুজৈধৃ তখরকরবালে

কে বলে মা তুমি অবলে

বহুবলধারিনীং মাতরং।//

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম

তুমি হৃদি তুমি মর্ম

তুংহি প্রানাঃ শরীরে।

বাহুতে তুমি মা শক্তি

হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি

তোমারই প্রতিমা গড়ি

মন্দিরে মন্দিরে।

তুংহি দূর্গা দশপ্রহরণ-ধারিনী

কমলা কমলদাস বিহারিনী

বাণী বিদ্যাদায়িনী

নমামি ত্বাং

নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং

সুজলাং সুফলাং মাতরং,

বন্দে মাতরং।

শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভুষিতাং

ধরনীং ভরনীং মাতরং।//

গবেষণার উদ্দেশ্যঃ

- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বন্দে মাতরম স্রোতের মধ্যে দিয়ে দেশ মাতৃকার যে রূপকথা ফুটে উঠেছে তার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা।
- ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বন্দে মাতরম মহামন্ত্রটি কিভাবে জাতীয়তাবাদী চেতনায় প্রভাব সৃষ্টি করেছিল তার মূল্যায়ন করা।
- সমকালীন ভারতীয় সমাজ এবং ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক কর্তব্যের অন্তর্নিহিত আদর্শের গুরুত্ব অন্বেষণ করা।

জাতীয়তাবাদঃ

জাতীয়তাবাদ হল একটি ভাবগত ধারণা। বংশ, ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি যেকোনো এক বা একাধিক কারণে একটি জনসমাজের মধ্যে গভীর একাত্মবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই একাত্মবোধের জন্য ওই জনসমাজের প্রত্যেকে সুখ দুঃখ ন্যায়-অন্যায়, অপমানের অংশীদার বলে নিজেকে মনে করে। এই জাতীয়তাবাদের সঙ্গে যখন দেশপ্রেম মিলিত হয় এবং একটি রাজনৈতিক আদর্শ গড়ে উঠলে তাকে জাতীয়তাবাদ বলে।

বন্দে মাতরমঃ

১৮৭৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্র বন্দে মাতরম নামে একটি সংগীত রচনা করেন। যা ১৮৮২ সালে আনন্দমঠের সঙ্গে যুক্ত হয়। কবি বন্দে মাতরম এর মাধ্যমে দেশকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করেন। এবং মায়ের অর্থাৎ দেশের রক্ষার্থে সবার ঐক্য ও সংগ্রামী ধারণার মনোভাবের সৃষ্টি করেন এই সংগীত এর মধ্য দিয়ে।

সংবিধানঃ

সংবিধান কথার অর্থ হল রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়ম-কানুনের সমষ্টি। এই সকল নিয়মকানুনকে দেশের প্রত্যেক নাগরিক যথাযথভাবে মেনে চলতে চলবে। আমাদের দেশের সংবিধান ১৯৫০ সালে ২৬ শে জানুয়ারি কার্যকর হয়।

মৌলিক কর্তব্যঃ

দেশের সংবিধান অনুসারে মৌলিক কর্তব্য বলতে বোঝায় দেশের জনগণের কিছু অবশ্য পালনীয় কাজ। বলা চলে মৌলিক অধিকার যেমন দেশের সাধারণ জনগণ ভোগ করবে তেমনি ওই সকল সাধারণ জনগনকে ও মৌলিক কর্তব্য পালন করতে হবে। ১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে মৌলিক কর্তব্য ভারতীয় সংবিধানে যোগ করা হয় শ্রীমতি গান্ধীর সময়ে।

পৌত্তলিকতাঃ

ঈশ্বরকে কোন দৃশ্যমান আকৃতি বা মূর্তিতে স্থাপন করে শ্রদ্ধা জানানো বা পূজা করাই হল পৌত্তলিকতা। সাধারণত মূর্তিপূজা কে বলা হয় পৌত্তলিকতা। অর্থাৎ যখন কোন ধাতু, পাথর মাটি বা কাঠ দিয়ে তৈরি মূর্তির মধ্যে ঈশ্বর বা দেবত্বের উপস্থিতি কল্পনা করে পুজো করা হয় তাকেই বলা হয়। হিন্দু ধর্মে এইরূপ মূর্তি পূজার বিশ্বাস আছে। মুসলমান খ্রিস্টান ও ইহুদি ধর্মে এইরকম পৌত্তলিকতাতে বিশ্বাস নাই।

বন্দে মাতরম কী?

দেশপ্রেমের সংগীত হিসাবে বন্দে মাতরম ব্যপকভাবে দেশপ্রেমিক বাঙালীর কাছে স্বীকৃতি পায়। সংগীত থেকে স্লোগান। জাতীয় জাগরনের মহামন্ত্ররূপে বন্দেমাতরমের প্রতিষ্ঠা। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ১৯২০-২১ সাল থেকে আসমূদ্র হিমাচল ব্যাপী যে স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছিল তার তিনটি জয়ধ্বনি ছিল

১। আল্লা হো আকবর

২। বন্দে মাতরম অথবা ভারত মাতা কি জয়

৩। হিন্দু মুসলমান কি জয়।

গান্ধীজি নিজেই 'ভারত মাতা কি জয় এর পরিবর্তে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনিটিকে বেশী পছন্দ করতেন। তিনি বলেছেন It would be a graceful recognition of the intellectual and emotional superior of Bengal. বন্দে মাতরম সংগীত রূপে একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি। বন্দে মাতরম আনন্দমঠের অংগীভূত নয়। একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বদেশ সংগীত। অরবিন্দের ভাষায় The vision of our Mother. একথা বলতেই হয় বঙ্কিমচন্দ্রের ঋষিদৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে সম্প্রসারিত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বন্দে মাতরম সংগীতে যে স্বদেশ প্রেমের ধ্যান করেছেন সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে তার যুগল শীল্প রূপ আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরানী।

উদ্ভাবনের ইতিহাসঃ

বন্দে মাতরম সর্ম্পকে গবেষনায় ১৯৩৭-১৯৫০ সাল এই ১৪ বছরের সময়সীমার মধ্যে আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের চিন্তাভাবনার কথা এসে পড়ে, ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামী ভারতের জাতীয় সংগীত ছিল বন্দে মাতরম। যদি ও 'সারে জাঁহা সে আচ্ছা হিন্দুস্থান হামারা' গানটির কথা বিশেষভাবে স্মরনীয়।

রাজনীতির ইতিহাস সহজ পথে চলে না। ১৯৩৭ সালে বন্দেমাতরমের অংগচ্ছেদ করলেন। পৌত্তলিকতার আপরাধে কংগ্রেস স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৭ সালে Newyork এ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারন সভায় জাতীয় সংগীত হিসাবেই জনগনমন কেই বাজানো হয়েছিল। এবং এই নিয়ে গনপরিষদের ভিতরে এবং বাইরে প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে উঠলে জওহরলাল গনপরিষদে বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন বাদ্যযন্ত্রে কোন সংগীত না থাকায় বাধ্য হয়েই এই ব্যবস্থা করতে হয়েছিলো। তারপর পরিষদ কতৃক গঠিত জাতীয় সংগীত নির্দ্ধারন কমিটি রায় দিয়েছিলেন যে এরপর থেকে 'বন্দে মাতরম' এবং 'জনগনমন' উভয়ই সংগীতকে ভারতের জাতীয় সংগীত হিসাবে স্বীকার করা হবে। বন্দে মাতরম হবে কণ্ঠ সংগীত। আর জনগনমন হবে যন্ত্রসংগীত। যদিও এই প্রস্তাবকে সবাই সমর্থন করেনি। তবে অসংগত হয়নি। কিন্তু গনপরিষদের অন্তিম অধিবেশনে এ সুপারিশ ও অগ্রাহ্য করা হয়েছিল।

তাৎপর্যঃ

একাধারে স্বদেশমন্ত্র এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরম স্বদেশসংগীত। বন্দে মাতরম ধ্বনি উচ্চারন করেই ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বঙ্কিমচন্দ্রের সপ্তকোটি দেশের মানুষ প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করেছিল। যেই উদ্দাম উত্তাল জনকল্লোলে ব্রিটিশেরা ভীত হয়েছিল। এবং বাধ্য হল ১৯১১ সালে বংগভঙ্গ রোধ করতে। বাঙালী প্রমান করেছিল সেদিনকার

সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্যের অধীশ্বরকে ও উদ্বেল জনসমুদ্রের কাছে মস্তক অবনত করতে হয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষ না হওয়া পর্যন্ত বন্দে মাতরম ই ছিলো অখন্ড ভারতের সমবেত স্বদেশ সংগীত, বন্দে মাতরম পর্যালোচনা করলে দেখা যায়-

১) তাঁর সর্বোৎ কৃষ্ট দান হল জননী জন্মভূমির মাতৃরুপ দর্শন।

২) তাঁর রচনার শ্রেষ্ঠভাব হল স্বদ্বেশধর্ম।

৩) স্বাধীনতা সংগ্রামে মানুষ যে অগ্রসর হয়েছিল তাঁর প্রেরনাদাতা ও রাষ্ট্রগুরু

হলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

জাতীয় জীবনে প্রভাবঃ

বন্দে মাতরম সংগীত ও ধ্বনি শুধু বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি, তা ধীরে ধীরে সারা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রধান ধ্বনি হয়ে উঠে ছিল খুব অল্প সময়ে। বিপিন চন্দ্রের মাধ্যমে দক্ষিন ভারতে বন্দে মাতরম এবং স্বদেশী গ্রহন সংকল্প প্রচারিত হয়। তৎকালীন মাদ্রাজের প্রখ্যাত কবি এস. ভারতী 'বন্দে মাতরম মন্ত্রে ব্যপকভাবে প্রভাবিত হয়ে ছিলেন। তুতিকোরিনে এই ধ্বনি ব্যপকভাবে প্রচারিত হয়। বন্দে মাতরম আন্দোলনের মাধ্যমে মাদ্রাজে বিদেশী কোম্পানীর এক চেটিয়া ব্যবসা বন্ধ হয়ে ছিল। বন্দে মাতরম ছিল আন্দোলন কারীদের কণ্ঠের বুলি। এক ১৫ বছরের কিশোরকে বন্দে মাতরম গাওয়ার অপরাধে ম্যাজিষ্টেট বেত্রাঘাতের নির্দেশ দিলে এর বিরুদ্ধে হরতাল শুরু হয়। যার বেশীরভাগই ছিল ছাত্র।

দক্ষিনভারতের এই আন্দোলন কিছু দিনের মধ্যে পশ্চিমভারতে পৌঁছে যায়। টাইমস্ পত্রিকায় উল্লেখিত আছে ভারতবাসী বন্দে মাতরমকে তাদের কণ্ঠের বুলি করে নিয়েছে। বন্দেমাতরমের অর্থ মাকে বন্দনা করা। দেশমাতার নামে এটি ভক্ত সন্তানের জয়ধ্বনি। লালা লাজপত রায় বন্দে মাতরম নামে উর্দু ভাষায় একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন। বম্বেতে ও বন্দে মাতরম দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছিল। নাগপুরের ছাত্ররা নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও স্বদেশী সভায় যোগদান করে বন্দে মাতরম সংগীত গান করেছিল।

গনপতি পূজায় মণ্ডপে মণ্ডপে মণ্ডপে তিলকের ফটো টাঙানো হল। মণ্ডপে বন্দে মাতরম ও 'ভারত মাতা কি জয় ধ্বনি তৎকালীন সময়ে ব্যপকভাবে উচ্চারিত হয়েছিল। য়াদ্রাবাদে প্রানের গান ছিল বন্দে মাতরম। ১৯০৫ এর আগে কর্নাটকে বন্দে মাতরম গান ব্যপকভাবে পরিচিত ছিল। ভেঙ্কট চার্য কানাড়ি ভাষায় আনন্দমঠ অনুবাদ করেছিলেন। ধীরে ধীরে সেনাবাহিনীতেও অনুপ্রবেশ ঘটল। ভারতের বাইরে লন্ডনের বিভিন্ন সভা থেকে বিপ্লবীরা বন্দে মাতরম ধ্বনি উচ্চারণ করে বিপ্লবী মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়েছিল। ফ্রান্সে বন্দে মাতরম নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ হত United State of America তে ও গদর আন্দোলনের নেতারা যখন মিলিত হতেন তখন তাদের পারস্পরিক অভিবাদন বানী ছিল বন্দে মাতরম। সরলা দেবীই বঙ্কিমচন্দ্রের সপ্ত কোটিকে প্রথম ত্রিশকোটিতে পরিনত করেছিলেন। বাংলার দেশাত্মবোধ প্রথম থেকেই দুটি প্রবাহে প্রভাবিত হয়েছে। বঙ্গভূমি ও ভারতভূমি। ১৮৯৬ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে গানটি সবাইকে মুগ্ধ করে ছিল।

ভারতের সংবিধানিক প্রয়োগঃ

আমাদের ধারনা বন্দে মাতরম আমাদের জাতীয় সংগীত। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে জাতীয় সংগীত বা রাষ্ট্রীয় সংগীতের কোন উল্লেখ নাই। আমাদের গনপরিষদ ১৯৪৯ সালে ২৬শে নভেম্বর ভারতের সংবিধান রচনা করে তা জাতিকে উপহার দেন। কিন্তু গনপরিষদের শেষ অধিবেশন বসে ১৯৫০ সালের ২৪শা জানুয়ারী। সেই দিনই সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ জাতীয় সংগীত সম্পর্কে বিবৃতি দেন। সংবিধান রচনা সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার দুই মাস পরে গনপরিষদেরঅন্তিম অধিবেশনে সদস্যগন যখন তাতে স্বাক্ষরের জন্য সমবেত হয়েছিলেন তখনই সভাপতি বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন জনগনমন ই হবে ভারতের রাষ্ট্রীয় সংগীত আর বন্দে মাতরম ও সমভাবে সম্মানিত হবে এবং জনগনমনের সম মর্যাদা পাবে।

"Shall be honoured equality with JANA GANA MANA and shall have equal status with it"

1973 সালে ভারতের তৎকালীন আইন মন্ত্রী-Hari Vinayak Gokhale সংবিধানের প্রারম্ভিক ভুমিকায় বলেছিলেন- The framing of the constitution was completed by November 26, 1949, and while a few of the provisions came in to force on that day, the remaining provisions came into force on January 26, 1950.- এই অবশিষ্ট বিধান সমূহের মধ্যে 'জাতীয় সংগীতের' কথা কোথাও উল্লেখ নাই। তাই গবেষনায় উল্লেখ করা হল। ভারতীয় সংবিধানে জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় সংগীত অর্ন্তভূক্ত হয় নি।

কেন্দ্রীয় নির্দেশিকাঃ

বর্তমানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশ দেয় প্রতিটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে বলা হয়েছে যে সব অনুষ্ঠানে জনগনমন এবং বন্দে মাতরম দুটি গাওয়া হয় সেখানে এবার থেকে বন্দে মাতরম কে আগে গাইতে হবে। শুধু তাই নয় এত দিন পর্যন্ত বন্দেমাতরমের প্রথম দুটি স্তবক গাওয়া হত তা সংশোধন করে তাকে মূল গানের বাকি চার স্তবক যোগ করল কেন্দ্র সরকার। বন্দে মাতরম ১৯০ সেকেন্ড গাওয়ার পর ৫২ সেকেন্ডের জনগনমন গাওয়া হবে। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময়, ভারতের রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল ও উপ-রাজ্যপাল আগমন ও প্রস্থানে, রাষ্ট্রপতির ভাষনের আগে ও পরে, নাগরিক সম্মানে এবং কুচকাআওয়াজে জাতীয় পতাকা নিয়ে আসার সময়ে বিদ্যালয়ের কাজ শুরুর আগে ও হবে বন্দে মাতরম। এবং এই সময়ে উঠে দাঁড়াতে হবে সকলকে।

বন্দে মাতরম ও মৌলিক কর্তব্য

১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে যে ১০টি মৌলিক কর্তব্য যোগ করা হয়েছিল বর্তমানে ১১টি মৌলিক কর্তব্য, যেগুলো বিশ্লেষন করলে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে প্রত্যেকটি ভারতবাসীকে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কতকগুলি কর্তব্য পালন করতে হবে যথা

১] জাতীয় সংগীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন,

২] যে সকল মহান আদর্শ স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামকে অনুপ্রানিত করেছিল সেগুলিকে অনুসরন করতে হবে।

৩] ধর্মগত, ভাষাগত বিভেদের উর্দ্ধে থেকে ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য ও ভাতৃত্ববোধকে সম্প্রসারিত করতে হবে।

৪] পরিবেশ রক্ষা।

৫] দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা।

বন্দেমাতরমে "সুজলাং, সুফলাম, মলয়জশীতলাম, শষশ্যশ্যামলাম মাতরম," এই লাইনটির মাধ্যমে একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যকে তুলে ধরা হয়েছে বা পরাধীন ভারতে জাতীয় সংগীত হিসাবে বিবেচনা থেকে শুরু করে ঐক্য ও স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল মন্ত্রই ছিল বন্দে মাতরম।

বির্তক ও সমালোচনা

পরাধীন ভারতবর্ষে বিংশ শতকের প্রথম দশকে মুসলীম লিগের আর্বিভাব এবং তাদের বিরোধিতার কারণে বন্দে মাতরমকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় পৌত্তলিকতার কারণে। এবং তা গবেষনায় আগে তুলে ধরা হয়েছে। আবার বর্তমান সরকার যখন বন্দে মাতরম সংগীতটিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গাওয়া বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ দিল তা নিয়ে বর্তমানে ভারতের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষা পটে এক নতুন বির্তকের সৃষ্টি করল, কারণ

১) এটি অনেকটা বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ডিফেন্স মেকা নিজম।

২) এই গানে দেশকে দেব দেবী রূপে কল্পনা করা 'হিন্দু ভারত' কল্পনার কাছাকাছি।

৩) বন্দেমাতরমের পুরো গানটাই জাতীয় জীবনে বাধ্যতামুলক করা আসলে ভারতের অসাম্প্রদায়িক ইতিহাসবোধকেই অমান্য ও বিকৃত করা।

৪) আনন্দমঠ উপন্যাসে ইংরেজেদের গালাগালি, মুসলমানকে শত্রু হিসাবে তুলে ধরা মেরুকরণের রাজনীতির পরিচয় দেয়।

৫) ১৯০ সেকেন্ড ধরে একটানা নির্ভুলভাবে পুরো বন্দে মাতরম গাওয়া সবার পক্ষে সম্ভব নয়।

৬) সংবিধানের ৩০ নং ধারায় উল্লেখ আছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিজেদের পছন্দমতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালনা করবে। কিন্তু সেখানে যদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রদের জোর করে হিন্দু দেব দেবীর গান গাইতে বলা হয় তাহলে তা মৌলিক অধিকারের উপর আঘাত আসতে পারে।

আবার আমাদের প্রস্তাবনায় যে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটিকে যোগ করা হয়েছিল যে কারণে তা হয়তো বন্দে মাতরম সংগীতের গাওয়ার মাধ্যমে অস্বীকার করা হতে পারে।

মূল্যায়নঃ

'বন্দে মাতরম' এর উপর গবেষনায় দেখা যায় এটি ইংরেজদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ভাবে সংগ্রামের অনুপ্রেরনা দেয়। যার ফলে ইংরেজরা এই ধ্বনি ও গানের বিরুদ্ধে ছিল। আবার পরাধীন ভারতের কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই পুরো গানটির বিরুদ্ধে ছিল। কারণ গানটিতে কেবল মাত্র হিন্দু দেব দেবীর কথা তুলে ধরা হয়েছে। আবার আনন্দমঠ উপন্যাসে মুসলিমদের শত্রু হিসাবে দেখা হয়েছে। তাই ভারতে হিন্দু মুসলিম ঐক্য বজায় রাখতে অথবা মুসলিম লীগের চাপে এই গানটির পুরোটিকে সমর্থন করা হয় নি। এবং গানের অঙ্গচ্ছেদ করে প্রথম দুটি স্তবক নেওয়া হয়েছে। যা ২০২৫ সাল পর্যন্ত চলে আসছিল।

কিন্তু ২০২৬ সালে বর্তমান সরকার বন্দে মাতরম রচনার ১৫০ বছর পুর্তিতে পুরো গান টিকে গাওয়া বাধ্যতামূলক করতে চাইছে। যে ধ্বনি ও গানটি স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান মূলমন্ত্র ছিল সেটি তার প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকার ফলে সারা ভারত জুড়ে গানটি নতুন করে চর্চার আঙিনায় চলে এসেছে। এবং হয়তো বন্দে মাতরম ধ্বনিতে সারা ভারত নতুন করে নিজেদের চিনতে শিখবে। কিন্তু বর্তমান সরকারকে খেয়াল রাখতে হবে আমাদের দেশের সংস্কৃতি হল মিশ্র সাংস্কৃতি। এখানে নানান ভাষা নানান ধর্ম, বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ। বন্দে মাতরম তার সম্মান পাক কিন্তু মনে হয় জোরকরে না চাপিয়ে।

আমি মনে করি সরকারকে এ বিষয়ে সদর্থক ভূমিকা নিতে হবে। কি ভাবে একটি ধ্বনি ও সংগীত পরাধীন ভারতে দেশবাসীকে বিপ্লবের প্রেরনায় অনুপ্রানিত করেছিল। দেশবাসীর মধ্যে ঐক্য বজায় রেখেছিল। ইংরেজদের মনে ভয়ের সঞ্চার ঘটিয়েছিল। এই সংগীত তার ইতিহাস দেশবাসীর সামনে তুলে ধরে মানুষের মনে স্থান করে দিক। তখনই হয়তো আমরা দেখতে পাবো এই বহু সাংস্কৃতিক দেশে মানুষরা 'জনগনমন' এর মতো বন্দমাতরমকে ও যথাযোগ্য সম্মান ও সংবিধানে বর্নিত মানুষের যে কর্তব্য পালন, তা বন্দে মাতরম গাওয়ার মাধ্যমে দেশের নাগরিক কর্তব্য পালন করে থাকবে।

সূত্র নির্দেশঃ

১) ভট্টাচার্য, জ. (১৯৭৮), বন্দে মাতরম, কবি ও কবি প্রকাশন, কলিকাতা।

২) Seal, A. (1971), The Emergence of Indian Nationalism: Competition and Collaboration in the later nineteenth century, Cambridge University Press, Cambridge.

৩) ভট্টাচার্য, জ. (১৯৭৮), বন্দে মাতরম, কবি ও কবি প্রকাশন, কলিকাতা।

৪)তদেব

৫) চট্টোপাধ্যায়, পা. প্র. (২০২৫) বন্দে মাতরম রচনাকাল ও রচনাক্ষেত্র কিছু অনুপ্ত তথ্য, দেজ পাবলিকেশন, কলকাতা।

৬) অত্যন্ত বিতর্কিত একটি বিষয় কারণ আজও পর্যন্ত অধিকাংশ লেখক বন্দে মাতরম এর রচনাকাল হিসেবে ১৮৭৫ সালকে দাবি করেছে কিন্তু একজন বঙ্কিম গবেষক হিসাবে পার্থপ্রতিম চট্টোপাধ্যায় ইতিহাস সম্মতভাবে প্রমান্য করেছেন উল্লেখযোগ্য সালটি তাই এক্ষেত্রে নির্ভুল প্রামান্য হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭) ভট্টাচার্য, জ. (১৯৭৮), বন্দে মাতরম, কবি ও কবি প্রকাশন, কলিকাতা।

৪) তদেব

৯) মজুমদার, র. (১৯৭১) বাংলাদেশের ইতিহাস, জেনারেল প্রিন্টার্য এন্ড পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।

১০) ভট্টাচার্য, জ. (১৯৭৮), বন্দে মাতরম, কবি ও কবি প্রকাশন, কলিকাতা।

১১) Tendulkar, D.G (1951) Mahatma, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi.

১২) চট্টোপাধ্যায়, ব. (১২৮৭) বঙ্গদর্শন, কলকাতা।

১৩) নিজস্ব প্রতিবেদন (২০২৬, ফেব্রুয়ারি ১২), আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা।

Citation: **প্রধান. বি.,** (2026) "বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরম: ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও মৌলিক কর্তব্য", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-4, Issue-03, March-2026.